সাহিত্যের উপজীব্য পলাশ ও তার ভেষজ ব্যাপ্তি

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

'পলাশ' এই নামেই তার পরিচিতি। বর্ষা তাকে সজীব করে। তবে রূপ দেয় বসন্ত। বছরভর অব্যক্ত পথের দু'পাশে, কখনও আবার জঙ্গলে শাল-পিয়ালের মাঝে ধুলো মাখা শরীরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে গাছগুলি, কিন্তু বদলে যায় বসন্তের ছোঁয়ায়। শাখা-প্রশাখা উপচে জেগে ওঠে উজ্জ্বল লাল-কমলার রঙিন ফুলের বাহারে, কোথাও বা হলদে। সেই রূপেই মোহিত হয়ে কবিতা, গান কত কিছুই না লিখে গেছেন বাংলার কবিরা। পলাশের সেই 'রাঙা হাসি' তো আর বছরভর মেলেনা। প্রকৃতির 'আগুন' রূপের সাক্ষী হওয়ার এই তো উত্তম সময়। আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

বাংলা সাহিত্য ও পলাশ---

'পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুন দিনের,
আজ এই সম্মানহীনের
দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা
যেথা আমি সাথীহীন একা
উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে
শস্যহীন মরুময় তীরে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনবোধের অনেক কবিতায় এই পলাশের সুর বেধেছেন। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের অংশ এই কবিতাটি, অদ্ভুতভাবে পলাশের অনেক ভেষজগুন ও আছে, জানিনা রবিঠাকুর কিতা জেনেই কাব্যগ্রন্থের নাম আরোগ্য রেখেছিলেন, না তা কাকতালীয়! শীতের শূন্যতার পর ফাগুনে পলাশ ও শিমুলের অগ্নিশিখা জ্বলে পথে প্রান্তরে। পাপড়ি মেলে হেসে ওঠে বাসন্তী ফুলেরা। যেন শীতঘুমের পর জেগে ওঠার গান ধরে প্রকৃতি। বসন্তের আগমনী বার্তা ছড়ায় পলাশ, শিমুল ও অশোকের অচিন্তনীয়রূপ।

যা প্রকৃতিকে লীলায়িত করে। পাতাঝরা গাছের শাখায় প্রকৃতি তার আপন লীলা. মত্ত হযে যেন লাল আবির ছড়ায়, আদর ও ভালবাসায়।ফুলেভরা বসন্তে চলে নানা ফুলের দখলদারিত্বের লড়াই, এই ফাগুনে রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করে বলতে হয়- 'গাঁয়ের মেঠোপথের ধারে অযত্নে অবহেলায় শিমুল পলাশের কোল জুড়ে হেসে উঠেছে রক্তিম ফুল,মনে হয় একি পলাশের বসন্ত নাকি বসন্তের পলাশ।'

শুধু রবিঠাকুর কেন, কবি নজরুল ও তাঁর গানে পলাশকে ঘিরে প্রেমের কথা বলেছেন- 'হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, এনেদে এনেদে, নইলে বাঁধবো না বাঁধবো না চুল।' এছাড়াও অজস্র বাংলা কবিতায় ছড়িয়ে আছে শিমূল-পলাশের বসন্ত বার্তা। দোলের আগেও পরে পলাশ ফুলে ছেঁয়ে যায় গ্রাম বাংলা। তাই হয়তো কবিদের প্রিয় বিষয়ে দোল ও পলাশ এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল, আজও তার রেশ এইটুকুও কমেনি। এছাড়াও পলাশের আগমন শুভ বার্তা বহন করে সবার মনে, তাই শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীতে বিদ্যাদেবীর আবাহনেও পলাশের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। বাংলা সাহিত্যেও রবীন্দ্র কাব্যের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে আছে পলাশ ফুল ও দোলের গান। যেমন ওরে গৃহবাসীতে-

'রাঙা হাসি, রাশি রাশি
অশোক পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে

মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে
রাঙা হিল্লোল,
দ্বার খোল, দ্বার খোল।'
বা ফাগুন হাওয়ার গান-
'তোমার অশোকেকিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে।
তোমার ঝাউয়ের দোলে..
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান,
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান
ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান।'

তাই বাংলায় দোল ও পলাশ ফুল একে অপরের পরিপূরক।

প্রজাতি পরিচিতি...

পলাশ বৃক্ষ পর্যায় পড়ে, এটি পর্ণমোচি জাতীয়। গাছের গোড়ার দিকটা অমসৃন হলেও এর শাখা-প্রশাখা খুব মসৃণ। ফাল্গুন মাসে এর পাতা ঝরে যায়,তখনই ফুলের কুঁড়ি আছে। চৈত্রে যখন ফুল ফোটে তখন এর অগ্নিকান্তিরূপ প্রকৃতিকে উদ্বেলিত করে। প্রাক্ বর্ষায় গাছে নতুন পাতা গজায়। একটি মূল বৃন্তে তিনটি পাতা থাকে, এর গঠন অনেকটা যেন পারিভদ্রেব (Erythrina indica) পাতার বৃহৎ সংস্করণ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর এই গাছ পাওয়া যায়। হিমালয়ের নিম্নাংশে প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই গাছ দেখা যায়। ভারত ছাড়া, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া প্রভৃতিদেশেও এই গাছটি আছে। সমগ্র ভারতবর্ষে এই গণের তিনটি প্রজাতি বর্তমান।এর বৈজ্ঞানিক নাম Butea monosperma kuntze, ফ্যামিলি- Fabaceae/papilionaceae, হিন্দিতে একটি টেসু বা ধাক্ বলে,অন্য দিকে সংস্কৃতে এটি কিংশুক নামে পরিচিত। পলাশ ফুলের কুড়ি দেখতে অনেকটা বাঘ নখের মত। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে চারটি রংয়ের পলাশ ফুলের তথ্য আমরা পাই, বাস্তবে কিন্তু সাদা ও গাড় লাল রঙের পলাশ সাধারণত দেখা যায়না। শুধুমাত্র লালচে-কমলা ও হলুদ রঙের পলাশ ফুলের প্রাধান্যই ভারতবর্ষে বেশি। এই ফুলের গঠন অনেকটা বক ফুলের মত। এই ফুলের আধারটির (calyx) গায়ে হাত দিলে ভেলভেটের মত মনে হয় এবং দেখতেও অনেকটা সেরকমই। ফলগুলো আকারে ছোট, অনেকটা সিমের মত। এক থেকেদেড় ইঞ্চি লম্বা, অনবনত ও ডাঁটার সঙ্গে লেগে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যেও পলাশ বহুল চর্চিত বিষয়--- কবির ভাষায়

অপেক্ষন্তেগুনাণ্ সর্বেমদনেতু ব্যতিক্রমঃ।
বসন্তস্যাপিতদ্বন্দ্বোঃ পলাশ কুসুমে যথা।।

অর্থাৎ এই জগতে গুণের আদর সবাই কবে কিন্তু প্রেমের স্বভাবেই ব্যতিক্রম। সেগুণী নির্গুণ মানেনা, সবার প্রাণেসমান সঞ্চার তার, আর প্রেমের মিত্র বসন্তের স্বভাবও তেমনি। সেও যখন উদিত হয় তখন গন্ধহীন পলাশের রং ধরায়। পলাশ ফুলের বর্ণনা দিতে কবি লিখেছেন- মদনাঘাতে ব্যাকুলিত হ'য়ে প্রস্ফুটিত যৌবনে বক্ষের কমল যুগলে করস্পর্শ করার পর মধু আহরণের সমাপ্তি পর্বে বাঁকা চাঁদের মত যে রদ চিহ্ন রেখে যায়, মনে হয় সেটা যেন ঠিক পলাশ ফুলের ছাপ। মনুসংহিতার নির্দেশনায় যারা চলেন তাদের

উপনয়নে অর্থাৎ পৈতে হওয়ার সময় পলাশ পল্লবের সমিধের দ্বারা হোম বা যজ্ঞ করার বিধি আছে। তেমনি সন্তান জন্মের পর ষষ্ঠী পূজোর দিন ভূতাপসরনে পলাশ পল্লবের প্রয়োজন, সেই রীতি,যা আজও গ্রামাঞ্চলের দেখা যায়।

এ তো গেলো সংস্কারের দিক, এবার নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যায়ও নতুন সাহিত্য ধারার দেখা মেলে- পল মানে গতি, সেই গতির সঙ্গে সঙ্গেই যার বিয়োগ তাই পল + অশ্ , আবার বৈদিক ধারায়ও বলা হয়েছে না, না পল মানে গতি ঠিকই, তবে সেই গতিকে যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ থামায় তাই পলাশ। যদিও অথর্ববেদে এর গুণগত সমীক্ষাকে ভেষজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছে বৈদিক কল্পের ১৭/৫২/৩২১ সূক্তে।

সমিধাগ্নিদুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তা তিথিম্।
অস্মিন্ হব্যা পলাশ তেহুবেম ধও রয়িমস্মেসুবিরম্।।

মহীধর এর ভাষ্যেও আমরা পলাশের বন্দনা দেখতেপাই। তিনি লিখেছেন - ওহে পলাশ, চলমান তার সঙ্গে গমনকারী পত্র অথবা চলমানতাকে যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ স্থিতিশীল করে তাই পলাশ। যজমান তোমার পরিচর্যা করেন অতিথি, অগ্নিও সমিধের জন্য ঘৃতের দ্বারা, অতিথিকে জাগরিত করে বলেন 'তোমার কাছে অতিথি বীরপুত্র এবং সেই পুত্ররূপী শোভন ধন তুমি স্থাপন করো'। বৈদিক ধর্মে পলাশ ফুল পূজার উপচার হিসেবেও ব্যবহৃত হয় যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বৈদ্যক তথ্য...

ভেষজ ঔষধ তৈরিতে এই গাছটির ছাল, পাতা, ফুল, বীজ ও গঁদের ব্যবহার আমরা চরকের সূত্রস্থানের তৃতীয় অধ্যায়েদেখতেপাই। বেদের সূক্তি অনুসারে দুগ্ধপিষ্ঠ পলাশ রস পানে বীর্যবান পুত্র লাভ হয়। চরক সংহিতায় কুষ্ঠ রোগ নিরাময়েও পলাশ বৃক্ষের ব্যবহার সুস্পষ্ট। সুশ্রুত সংহিতার চল্লিশ অধ্যায়ে একে বাতহর ও কৃমিনাশক হিসেবে বর্ননা করা হয়েছে। অন্যদিকে সপ্তম শতকের বাগ্-ভটে একে রক্তপিও নাশক হিসাবে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও চরক সংহিতায় এই গাছটিকে অর্শরোগের প্রতিকারক রূপে বর্ননা করা হয়েছে। এই গাছের গঁদ বৈদিক তথ্যানুসারে অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষধ। অতিসার, রক্তপ্রদর ও শূলরোগেও এর ব্যবহারের তথ্য আমরা পাই।এই গাছের গঁদ অস্থির গর্ভকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

চরক সংহিতার মতোএকাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ চক্রদত্তেও একে অর্শরোগের প্রতিষেধক হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। ভেষজ তথ্য- মনোস্পার্মা (লিম) কুন্টজ, যা পলাশ নামে পরিচিত, এতে বর্তমান উদ্ভিদ রাসায়নিক গুলোর অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষুধীগুন আছে। বিভিন্ন গবেষণা পএ থেকেজানা গেছে এই গাছের বিভিন্ন অংশের নির্যাসে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল,অ্যান্টি-ডায়রিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিক, হেপাটোপ্রোটেক্টিভ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-হেলমিন্টিক, অ্যান্টি-কনভালসিভ, অ্যান্টিস্ট্রেস,অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি জাতীয় উদ্ভিদ রাসায়নিক (phytochemicals বা secondary metabolites) বর্তমান। এটি গলগন্ড, স্পার্মাটোরিয়া এবং সাপের কামড়ের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। এতে উপস্থিত মুখ্য ফাইটোকেমিক্যাল গুলো হল-বুট্রিন, আইসোবুট্রিন, বুটিন, বিউটিন, প্যালাসিট্রিন, প্রটিওলাইটিক ও লাইপোলাইটিক এনজাইম। এছাড়াও ইয়োপসিন, গ্যালিক অ্যাসিড, স্টিগমাস্টেরল, মেডিকারপিন, কাজানিন, আইসো-ফরমোনোনেটিন, হেক্সানোয়িক অ্যাসিড ইত্যাদি।

লোকায়তিক ব্যবহার...

পলাশের পাতা ও বীজচূর্ণ কৃমিনাশক, রক্তপ্রদর, উদরশূল ও অর্শরোগের নিরাময়ে আজও গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া লাবণ্য রক্ষায় পলাশের কচিপাতার রস প্রসাধনী হিসেবে অতীতকাল থেকেই অত্যন্ত

জনপ্রিয়। পলাশের ছাল অর্শরোগের প্রতিষেধক, গাত্রদাহেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পলাশ বীজের চূর্ণ লেবুরসের সাথে মিশিয়ে খোস-পাচড়ায় লাগালে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। গ্রামবাংলায় এই গাছের ছাল আদা রসের সাথে মিশিয়ে সর্পবিষের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ফুলও মূত্রকারক, রজস্রাব বর্দ্ধক এবং অতিসারে ব্যবহৃত হয়।

সৌন্দর্যের অনাদৃত রূপ---

'দেখিতে পলাশ ফুল অতিমনোহর,
গন্ধ বিনে তারে সবে করে অনাদর।'

উল্লেখিত পংক্তিটির মধ্যে প্রকৃতির এক চমৎকার বৈপরীত্য ধরা পড়েছে। পলাশ ফুলের রঙ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর। বসন্ত এলে গাছের ডালে ডালে লাল-কমলা রঙের আগুন জ্বলে ওঠে, যা প্রকৃতিকে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলে, কিন্তু এই ফুলের কোনোগন্ধ নেই। আর তাই সমাজ একে অন্য ফুলের মতো মূল্য দেয় না। এটি আমাদের সমাজের বাস্তবতাকেও প্রতিফলিত করে। অনেক সময় বাহ্যিক সৌন্দর্যমুগ্ধ করলেও কোন একটি গুণের অভাবে মানুষ কাছে সে অবহেলিত। একই ভাবে, সুগন্ধযুক্ত ফুল যেমন রজনীগন্ধা বা চামেলি অনেক মূল্যবান, কারণ তাদের সৌরভ মানুষ ও পরিবেশকে মোহিত করে। তবে প্রকৃত সৌন্দর্য কি শুধুই সুগন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ? পলাশ ফুলের মতো অনেক কিছুই আছে, যা হয়তো কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে কিছুটা কম কিন্তু তবুও তার একটি নিজস্ব সুদৃশ্যতা ও ভেষজ মহিমা আছে। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যকেই আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। পলাশ তার রঙের মাধ্যমেই বসন্তকে স্বাগত জানায়, ঠিক তেমনই প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব সৌন্দর্যেরও গুরুত্ব আছে, যা কেবল বাহ্যিক উপাদানে নির্ভর করেনা। অতএব, পলাশ ফুলের গন্ধ না থাকলেও তার শোভা ও ভেষজগুন অনস্বীকার্য। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোন কিছু মূল্যায়ন করা উচিত নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে স্মৃতিমেদুর পলাশ আজও আমাদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে। মনে পড়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর প্রান্তরের কথা। যেখানে ভারত সূর্য অস্তমিত হয়েছিল ব্রিটিশ শক্তির কাছে, সম্ভবত সেই পলাশীও ছিল পলাশ বন।

তথ্যসূত্র-

১) কে. নাদকার্নি, ইন্ডিয়ান ম্যাটেরিয়া মেডিকা, জনপ্রিয়প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ভলিউম ১;পৃষ্ঠা ২২৩।

২) ভারতের আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়া, খণ্ড-১, সংস্করণ-১, আয়ুষ, দিল্লি, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯।

৩) চিরঞ্জীব বনৌষধী, তৃতীয়খন্ড, শিবকালী ভট্টাচার্যী, আনন্দ পাবলিশার্সপ্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ২২৬ - ২৩৩।

৪) জৈন, এ., বেন্নি, ডি. এন., ও অশ্বিনী, এস. এম. (২০২১). প্রমেহ (টাইপ-২ ডায়াবেটিস) রোগেপলাশ বীজের ভেষজ ও ক্লিনিকাল কার্যকারিতা। আয়ুষধারা, ৮(৫), ৩৪৫০,৩৪৫৬.

৫) পটেল, জি., দ্বিবেদী, এন., ও ত্রিপাঠি, আই. পি. (২০১১). পলাশ গাছের জৈবরসায়নিক গবেষণা। কারেন্ট রিসার্চজার্নাল অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ৩(২), ৯৩,৯৬.

৬) ধাকড়, জি. জি., গাঞ্জিওয়ালে, এস. ভি., নওঘারে, এস. এম., শ্রীরাও, এ. ভি., কোচার, এন. আই., ও চান্দেওয়ার, এ. ভি. (২০২৩). পলাশ গাছ ও এর ঔষধি ব্যবহার সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা। রিসার্চ জার্নাল অফ ফার্মাকোগনোসি অ্যান্ড ফাইটোকেমিস্ট্রি, ১৫(২), ৮৭, ৯৪.